# সেদিনের সন্ধ্যাফেরি

তসলিমা নাসরিন

মানুষের দীর্ঘ লাইন। ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে, তবু দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। জয় গোস্বামীর কবিতা শুনবে বলে আসা। কবি আজ নিজের কবিতা পড়বেন। জয়ের কবিতা শোনার সুযোগ এ শহরে খুব বেশি মানুষের হয়না। তাই এই সুযোগকে কেউ মুঠোছাড়া করতে চাইছে না। ব্যবস্থাপনায় যাঁরা ছিলেন, পাঁচটার জায়গায় সাড়ে পাঁচটা বাজিয়ে ফেললেন শুরু করতে করতে। চারশ শ্রোতা। এই চারশয়, আমার বিস্মিত চোখ দেখলো, চারজনও চেনা কবি নেই। শহরের কবিরা কোথায়? বৃদ্ধ কবিরা ঘরবার হননি হয়তো, কিন্তু কোথায় সহস্র তরুণ কবি? বাংলা সাহিত্যের এ সময়ের সবচেয়ে বড় কবি তাঁর কবিতা পাঠ করবেন, সতীর্থ কবিদের তো স্বভাবতই উৎসাহে টগবগ করার কথা। দিন কি তবে পাল্টে যাচ্ছে? কবিরা দিন দিন খুব একা হয়ে যাচ্ছেন?

জয় নিজের কবিতার বই *সন্ধ্যাফেরি ও অন্যান্য কবিতার* উন্মোচন নিজেই করলেন। নিজের কষ্ট সুখ, নিজের প্রেম অপ্রেম, ক্ষোভ অভিমানের উন্মোচন অন্য কাউকে করা কি মানায়? অনুষ্ঠানে যে কবিতাগুলো পড়বেন বলে জয় ভেবে রেখেছেন সেগুলো চিঠির মতো, কাউকে চিঠি পড়ে শোনানোর মতো অনেকটা। বললেন, *পঁচিশ তিরিশ বছরের কবিতার মধ্য থেকে বেছে হয়তো একটিই কবিতা পড়ছি।* কবিতার কোনও নাম থাকার দরকার হয় না এ কথা জানিয়ে নাম উল্লেখ না

করেই কিছু কবিতা পড়লেন। নামহীন কবিতাগুলো পড়ে যাচ্ছেন একটির পর একটি, কবিতাগুলো সব *একটি-কবিতা* হয়ে উঠছে, অনেকগুলো নদী একটি সমুদ্র হয়ে উঠছে। জয়ের যাদুতে অভিভূত হতে হতে নিজের অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বিশালতার দিকে আমরাও যেতে থাকি, যারা শুনছি। জয় শুরু করলেন কবিতা, *সে শুধু বানের জলে ভেসে আসা সৌভাগ্য আমার। সে কিছু না, কিছু না। সে শুধু জলের নিচে ডুবে থাকা সোনার কলস। সে কিছু না।* সে তো নিশ্চয়ই *কিছু।* খুব জরুরি *কিছু।* ডুবুরির মতো জয় জলের নিচে গিয়ে সোনার কলসটি উঠিয়ে আনেন আর দু হাতে ছড়াতে থাকেন ভিতরের রত্নরাজি। আমাদের সমৃদ্ধ করতে থাকেন। এক-ঘর-প্রেমে তখন ঘর নিথর।

*একবার, আমাকে আর একবারের জন্যও কি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারো না কবেকার সেই শেষ হয়ে যাওয়া চুম্বনে?*

*এত যদি লুকোছাপা করলাম দুজনে, বলো, শান্তি পেলাম কি দুজনের কেউ?*

*যদি বলি আমিই সেই পুরুষ দেখ, যার জন্য এতকাল অক্ষত রেখেছো ওই রোমাঞ্চিত যমুনা তোমার?*

*..পৃথিবী দেখুক এই তীব্র সূর্যের সামনে তুমি সভ্য পথচারিদের আগুনে স্তম্ভিত করে রেখে উন্মাদ কবির সঙ্গে স্নান করছো প্রকাশ্য ঝর্নায়।*

*এতই অসার আমি চুম্বনও বুঝিনি। মনে মনে দিয়েছিলে, তাও তো সে না বোঝার নয়!*

*..দশক শতক ধরে ধরে ঘরে পথে লোকালয়ে স্রোতে জলস্রোতে আমাকে কি একাই খুঁজেছো তুমি? আমি বুঝি তোমাকে খুঁজিনি?*

*..তোমাকে সেই একশ বছর আগেকার ডাকনাম ধরে ডাকছে, একেবারে নিঃশব্দে ডাকছে একেবারে নিঃশব্দে ডাকছে, চই চই চই, তুমি বোধহয় কিছুই শুনতে পাচ্ছো না, তাই না?*

*পায়ে পায়ে মরুভূমি পার, বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে দেখ, আমি বুঝি বন্ধু না তোমার?*

এরপর কোনও এক দুপুর নিয়ে কবিতা। দুপুরকে তিনি *প্রকাণ্ড নিথর জলাশয়* বলছেন। এর নিচে তিনি এবং তাঁর নারী শুয়ে থকবেন, ঘুমোবেন না, জেগে উঠবেন না, জন্ম নেবেন না একবারও, কারণ ওই জলাশয়ের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে কাল, কারণ জয় তখন ভালোবাসছেন।

পড়তে পড়তে কিছু কবিতায় গিয়ে, কবিতার নামের যে প্রয়োজন, টের পেলেন। *প্রাক্তন* নামের কবিতাটি পড়ার আগে জয় বললেন, *এই কবিতার নাম থাকার দরকার আছে।* কবিতার মেয়েটি যে তার প্রাক্তন স্বামীর কথা বলছে, তা বোঝানোর জন্য বোধহয়। অবশ্য নাম না থাকলেও বোঝা যেত কে বলছে কার কথা। কবিতাটি শুনে, আমার পাশে বসে ছিলেন একজন ভদ্রলোক, বললেন *চোখে জল চলে আসছে।* তিনি না হয় কিছুকাল ধরে বিচ্ছেদে থাকা তাঁর স্ত্রীর কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু চোখে কেন আমারও জল এসেছিল! আমি তো প্রাক্তন কোনও স্বামী ঠিকমতো খেল কিনা, পরলো কিনা, বাড়ি ফিরলো কিনা এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মানুষ নই! তার ওপর সেই স্বামী, যে স্বামী স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে! কবিতাটি খুব সহজ করে জয় বলে গেলেন বটে, বুকের ভিতরে কিন্তু তিরতির করে

কাঁপিয়ে, জল ঝরিয়ে। ভালোবাসা ভালোবাসা। কার আছে কার জন্য কী জন্য সে কথা অন্য। ভালোবাসা চোর ডাকাতের জন্য, খুনির জন্য, এমনকী অত্যাচারী রাজার জন্যও কারও কারও থাকে। তাতে কী! ভালোবাসার সেই বোধটিই আসল, যেটি মানুষকে আকাশছোঁয়া করে তোলে। শত ঝড় তুফানেও বোধটি নিশ্চুপ সামনে দাঁড়ায়, নিঃশব্দে নৈঃশব্দ নাড়ায়। ভালেবাসার যে ভিতরঘর, তার ভিতরঘরের ভিতরেও তাঁর শ্রোতাদের নিয়ে গেছেন জয় । জটজটিলতাগুলো আলগোছে খুলতে জানেন বলেই আক্ষেপ করে বলেন, এত অসার তিনি যে মনে মনের চুম্বন বোঝেননি। ওই বুঝতে না পারার কথা বলেই তো তিনি বোঝালেন খুব গভীর করে বোঝেন তিনি প্রেম। প্রেমে সংক্রামিত হই আমরাও, যারা শুনছি।

তিনজন কবিকে নিয়ে কবিতা। *শিল্পের পিছনে ছুটে শিল্পের সম্মুখে ছুটে শেষে হাতের ওই একমুষ্ঠি অগ্নিরজ্জু জড়িয়ে পেঁচিয়ে নিংড়ে* যাকে *ঘসটাতে ঘসটাতে রাসবিহারি এভিন্যুতে দু দশ পঞ্চাশ একশ গজ.* এনে মারলো, বড় মায়া-মায়া স্বরে জিজ্ঞেস করলেন সেই জীবনানন্দ দাসকে, *কে তোমাকে ভালোবাসতো? লুকিয়ে কি চিঠি লিখতো কেউ?* শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে জয়ের তেমন কোনও ঘনিষ্ঠতা ছিল না, কবিতা নিয়ে কখনও কোনওদিন কথা হয় নি, যদিও শক্তির কবিতা আকৈশোর ভালোবাসেন তিনি। গোঁফ পেকে যাওয়া শক্তি, উদাসিন হয়ে যাওয়া শক্তির সেই দিনগুলোর কথা বললেন, *একটা দুরত্ব ছিল, যে অবস্থাতে আছেন, যেন ঠিক সে অবস্থাতে নেই।* হাসপাতালে কবি বিনয় মজুমদারকে দেখতে গিয়েছিলেন জয়।

কারও দেওয়া একটি সন্দেশ রাখা আছে বিছানায়, আর এক পাশে কাত হয়ে ঘুমোচ্ছেন বিনয়। কবিতার মন্ত্রে তিনি মনে মনে সুস্থ করছেন বিনয়কে-- *স্বপ্নে স্বপ্নে পুরো একটা মানুষ পুড়ে খাক। আমরা তবু স্বপ্ন পড়ছি, মন্ত্র পড়ছি বসে। বালাই বালাই অসুখ তাড়াই, অসুখ ছেড়ে যাক।*

কলকাতা নামক এক অপরূপ বাদ্যযন্ত্রের গায়ে তাঁর হাত খেলছে, এটি কবিতার কথা। কলকাতার প্রসঙ্গ এলো বলে জয় ঠিক করলেন শহরের কবিতা বলবেন কিছু। আনন্দশংকরকে ভুল পোশাকের কারণে ক্যালকাটা ক্লাবে ঢুকতে না দেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ করে জয় কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটি পড়ার সময় জয়ের জল-কণ্ঠ থেকেও ফুলকির মতো ছিটকে বেরোচ্ছিল আগুন। *আমরা কেবল তর্ক করবো টেবিল চাপড়ে, ভিখিরিদের ভিক্ষে দেওয়া উচিত কিনা।* তাঁর আগুনকে, ক্ষোভকে তিনি বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেই কবিতার কাছে। *আমরা তো অল্পে খুশি, কী হবে দুঃখ করে! আমাদের দিন চলে যায় সাধারণ ভাত কাপড়ে, চলে যায় দিন আমাদের অসুখে ধারদেনাতে।* গল্প বলতে বলতে বলছেন কবিতা। অভাবের সংসার। ভাই গেছেন বাজারে, মাছ কিনলেন না, মাংস কিনলেন না, সস্তায় একটি গোলাপ চারা কিনে এনে দিলেন যেন দেখে দেখে কবিতা লেখেন জয়। জয় তখনই লিখেছিলেন সেই অসাধারণ কবিতাটি,.. *বাড়ি ফিরি দুপুর রাতে, খেতে বসে রাগ চড়ে যায়। নুন নেই ঠাণ্ডা ভাতে। রাগ চড়ে মাথায় আমার, আমি তার মাথায় চড়ি।*

*বাপ বেটা দুভাই মিলে সারা পাড়া মাথায় করি। করি তো কার তাতে কী। আমরা তো সামান্য লোক, আমাদের শুকনো ভাতে লবনের ব্যবস্থা হোক।*

শহর দেখতে দেখতে দেখলেন শহরের উচ্ছেদের ঘটনা। টালিনালার বস্তি-উচ্ছেদ করে স্তূপ স্তূপ মাটি রাখা হয়েছে। জয় আর পথে যেতে যেতে বস্তির লোকগুলোকে দেখতে পান না। খুঁজছেন তিনি ওদের, *লোকগুলো কোথায়?..কাগজ কুড়োয় কেউ, কেউ ঠেলা চালায়, কেউ খুদকুড়ো পায় রঙের ফ্যাক্টরি আর বাক্স কারখানায়। মেয়েগুলো ঠিকে খাটে, এক একজন সঙ্গে হলে সল্টলেকের রাস্তায় দাঁড়ায়। ..* লোকগুলো নেই কোথাও। অন্যায়, অবিচার, অমানবিকতা জয়ের সয় না। তিনি নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে নির্বাধ প্রতিবাদ করেন। উৎকণ্ঠা কবির কণ্ঠে। প্রেমিক-জয় যখন মানবতাবাদী হয়ে ওঠেন, খুব বড় লাগে তাঁকে দেখতে। জয় আরও বড় হয়ে ওঠেন বাউলের কবিতায়। জাত-পাত অস্বীকার করে তিনি তখন প্রচণ্ড অসাম্প্রদায়িক। জয় নিজেই বললেন বাউলের জীবন অনেকটা কবিদের মতো। অত স্পষ্ট করে কিছু বলে না বাউলেরা। উচ্চবর্গের লোকদের ফতোয়ায় ভগবান নিয়ে কিছু বলা তাদের বারণ। তাই সংকেতেই বেশি গান তারা গায়, যে গানগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে দেহতত্ত্বের গান। বাউলদের নিয়ে মানবতার গান গাইতে থাকেন জয়, বাউলদের মতো সংকেতে নয় কিন্তু, সজোরে,স্পষ্ট করে।

মাকে হারিয়ে মায়ের মতো কাউকে নিয়ে লেখা কবিতা পড়লেন, কোনও পাড়ার মাসিমা *যার আঁচলে বাগান, মাথা ভর্তি শ্বেতশুভ্র চুলে পালাতে না পেরে আটকে আছে*

*কাল রাতের দুটো চারটে তারা....।* পুরো দু ঘণ্টা কবিতা পড়েছেন জয়। দু ঘণ্টার জায়গায় এক ঘণ্টা হলে সম্ভবত ভালো হত। কবিতা শুনতে হলে যেরকম দরকার সেরকম নৈঃশব্দ ছিল না ওখানে। কেউ কেউ বলেছে, দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে হলে যেমন আসন দরকার, তেমন আসনও ছিল না। অনেক কিছুই হয়ত ছিল না, কিন্তু সব না থাকাকে তুচ্ছ করে দিয়ে জয়ের কবিতা ছিল। প্রেমের, শহরের, উচ্ছেদের, দারিদ্রের, দেশভাগের, আত্মহত্যার আর শ্মশানের কবিতা। যে কবিতায় ছিল চিত্রল চিত্রকল্প। যে কবিতা শব্দে আর ধ্বনিতে ধনী, যে কবিতা ভাসায় ভালোবাসায়। ।

সেদিন সন্ধেবেলাটা জয় আমাদের তাঁর ফেরিতে করে শব্দের স্বখাত-সমুদ্রে ভাসিয়ে আনলেন। আমরা এক একজন শব্দমুগ্ধ সম্মোহিত স্থবির দাঁড়িয়ে রইলাম, আর হাত-ছোঁয়া দূরত্বে দাঁড়িয়ে থেকেও জয় আকাশ হয়ে রইলেন।